বীরভূমের লোকসংস্কৃতি : প্রসঙ্গ লোকধর্ম ও লৌকিক দেবদেবী

দেবশ্রী ঘোষ

গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, সিকম স্কিলস্ ইউনিভার্সিটি, বোলপুর

ও

সত্যসৌরভ জানা

তত্ত্বাবধায়ক, ইতিহাস বিভাগ, সিকম স্কিলস্ ইউনিভার্সিটি, বোলপুর

ও

মনোজ মণ্ডল

সহ-তত্ত্বাবধায়ক, সিকম স্কিলস্ ইউনিভার্সিটি, বোলপুর

সারসংক্ষেপ : সভ্যতার আদি পর্বে মানুষ যখন তাঁর থেকে অধিক ক্ষমতাশালী প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বন্য জন্তুদের কাছে নিজেদের অসহায় বোধ করেছিল, ঠিক তখনই প্রতিকূল পরিবেশকে প্রতিহত করতে এবং নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য তাঁর থেকে ক্ষমতাসম্পন্ন কোন কিছুকে 'দেবতা' রূপে কল্পনা করতে শুরু করে। নিজেদের মনের কল্পনা অনুসারে তারা দেবতার রূপ দান করেছিল। সেই রূপই আদিম কাল থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে চলেছে। মানুষের মনের বিবর্তনে এই সকল দেবতার পরিবর্তন হয়েছে ঠিকই কিন্তু মানুষের মনের উদ্দেশ্যের কোন পরিবর্তন ঘটেনি, মানুষের মনের ইচ্ছাপূরণের জন্য এই দেবতারাই পরবর্তীকালে 'লৌকিক দেবদেবী' নামে অভিহিত হয়েছেন। বীরভূম জেলায় বিভিন্ন লৌকিক দেবদেবী দেখা যায়, সেগুলি হল—ধর্মঠাকুর, ক্ষেত্রপাল, শিবঠাকুর, ব্রহ্মচারী ঠাকুর, সত্যপীর, মারাং বুরু, চণ্ডী, পলাশবাসিনী, মনসা, বিশালাক্ষী, ইতু দেবী, কৃষ্ণকালী, ভাদু, ভাঁজো ইত্যাদি।

সূচক শব্দ : বীরভূম জেলা, লোকসংস্কৃতি, ধর্মঠাকুর, ক্ষেত্রপাল, চণ্ডী, মনসা, শীতলা, ভাদু, লৌকিক দেবদেবী।

মূল আলোচনা :

ধর্মঠাকুর : "ধর্মঠাকুর মূলতঃ ছিলেন প্রাক আর্য আদিবাসী কোমের দেবতা, পরে বৈদিক ও পৌরাণিক দেশী ও বিদেশী নানা দেবতা তাহার সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া ধর্মঠাকুরের উদ্ভব হইয়াছে।"[১] এছাড়া "ধর্মঠাকুরের যে রূপ ধর্মপূজায় পুঁথি এবং ধর্মমঙ্গল কাব্যে পাওয়া যায় সেই পরিকল্পনায় ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সঙ্গে বহিরাগত বিশ্বাস ও সংস্কার মিশে গেছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে ভারতীয় ও ইরানীয় সূর্য পূজার ধারা এবং পলিনেশীয় আদি দেবতার বিশ্বাস এর মধ্যে বর্তমান। অধ্যাত্মভাবনা এবং অনুষ্ঠানের সঙ্গে

অবৈদিক ও লৌকিক ঐতিহ্যের ধারা মিশ্রিত হয়েছে।"[২] মনে করা হয় বীরভূম অঞ্চলে একসময় বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রাধান্য ছিল, তাই এর সূত্র ধরেই ধর্মঠাকুরের পূজা প্রচলিত হয়েছে। অন্যদিকে ধর্মঠাকুর যমরাজারও আর একটি নাম। বীরভূমে ধমর্ঠাকুরের জনপ্রিয়তা প্রবল।

আসলে ধর্মঠাকুরের কোনো বিশেষ রূপ নেই। নানান ধরনের শিলার মাধ্যমে ধর্মঠাকুরের পূজা করা হয়, তবে বর্তমানে কোনো কোনো স্থানে ধর্মঠাকুরের মূর্তি দেখা গেছে। ধর্মঠাকুরের পূজারীকে দেয়াশী বলা হয়। পূর্বে নিম্নবর্ণের মানুষেরা দেয়াশী পদে কাজ করলেও পরবর্তীকালে এই পদে উচ্চবর্ণের প্রতিনিধিদের দেখা যায়। সম্ভবত লাউসেনের দ্বারা পূজিত হয়ে ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল ধর্মঠাকুর। ধর্মঠাকুরের পূজা উপলক্ষ্যে ভক্তদের কয়েকদিনের জন্য সন্ন্যাসীর মতো জীবন-যাপন করতে হয়। এই সন্ন্যাসীদের ভক্ত্যা বলা হয়। পূজার দিন ভক্তরা মাথায় দুধ বা জল বা মদ ভর্তি হাঁড়ি বা কলসি নিয়ে নাচে এবং গ্রাম পরিক্রমা করে। অন্যদিকে ধর্মঠাকুরের প্রতীক যন্ত্র হল বাণেশ্বর। কোনো কোনো স্থানে এই বাণেশ্বর বাণ গোঁসাই নামে পরিচিত। একটি বাণ বা শলাকাখচিত লম্বা কাঠের টুকরো বা পাথরের টুকরোকে বাণেশ্বর বলা হয়। ধর্মপূজার দিন বাণেশ্বরকে স্নান করানো হয়। তারপর একসাথে পূজা করা হয়।[৩]

এই ধর্মঠাকুর বা ধর্মরাজ হল রাঢ়ের জাতীয় দেবতা। বীরভূম জেলায় এমন কোন গ্রাম নেই যেখানে ধর্মরাজ পূজিত হন না। ধর্মরাজকে যমরাজ, শিব এবং বিষ্ণু বলেও মনে করা হয়। দৈহিক ক্ষমতার অধিকারী ডোম, বাগদি, হাড়ি প্রভৃতি শ্রেণির দেবতা ধর্মরাজের পুজোয় রাজকীয় আড়ম্বর লক্ষণীয়। "তাই ড. সুকুমার সেন বলেছেন, ধর্মরাজ নিম্নশ্রেণির দেবতা হলেও তিনি রাজদেবতা বা রাজশক্তির প্রতীক।"[৪] সাধারণত ধর্মঠাকুর নিরাকার। তবে বিভিন্ন স্থানে তিনি গোলাকার শিলাখণ্ড আবার কোথাও কূর্মমূর্তিতে বিরাজিত। বাহন হিসাবে ঘোড়ার সঙ্গে ধর্মঠাকুরের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। ধর্মরাজ ঠাকুরের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পীঠ হল— ইলামবাজারের দেবীপুর, বারুইপুর; সিউড়ীর ভাণ্ডারীবন, পুরন্দরপুর; নানুরের বড়া, মোহনপুর, খুজুটিপাড়া; দুবরাজপুরের চিনপাই; বোলপুরের গোয়ালপাড়া; সাঁইথিয়ার বেলেগ্রাম। রোগ নিরাময়ের দেবতা রূপে ধর্মরাজ ঠাকুর পরিচিত। সাঁইথিয়ার বেলেগ্রামে ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল মানুষেরা বাতের ব্যথা থেকে মুক্তি পেতে ধর্মরাজের থানে ভিড় করেন।

"ধর্মঠাকুরকে নানা গ্রামে নানা নামে ডাকা হয়ে থাকে। কালু রায়, চাঁদ রায়, সুন্দর রায়, অনাদিনাথ, কটা রায়, খেলারাম, দামোদর রায়, বাঁকা শ্যাম, মানিকলাল, রঘুনাথ ইত্যাদি নামগুলির পেছনে স্থানীয় ঐতিহ্য লুকিয়ে রয়েছে।

১। কুড়ামিঠা-ইলামবাজারে। এখানে উত্তরপাড়ায় সুন্দর রায়, দক্ষিণপাড়ায় বুড়ো রায় এবং চাঁদ রায় রয়েছেন।

২। ঘুড়িষা- ইছাপুরে রয়েছেন বুড়োরায়। ব্রাহ্মণদের দ্বারা পূজিত হন। হরিহরপুরে আছেন বুড়োরায়। কৈবর্ত্যপাড়ায় কালারায়।

৩। দেবীপুর- এখানে শিলাময় ধর্মরাজ আছেন।

৪। পায়ের- মন্দিরে ধর্মরাজ রয়েছেন।

৫। বারুইপুর- এখানেই ধর্মমঙ্গলের লাউসেন ধর্মঠাকুরের পূজা করে সিদ্ধিলাভকরে যুদ্ধে ইছাই ঘোষকে হারিয়েছিলেন। সিদ্ধিলাভ করেছিলেন বলে ঠাকুরের নাম 'সিদ্ধেশ্বর'। কাছেই অজয় নদী। তার দক্ষিণ পাড়েই আছে শ্যামারূপা গড় ও দেউল।

৬। ভগবতীবাজার- অজয়ের উত্তরে অবস্থিত। চাঁদরায়, সুন্দররায় ও শ্রীধররায় রয়েছেন। সঙ্গে আছেন মড়কচণ্ডী।

৭। কেন্দ্রগড়িয়া- খয়রাশোলে। ধর্মরাজ এখানে বুড়োরায়।

৮। পলপাই- খয়রাশোলে। ইনি এখানে 'চন্দ্রেশ্বর' নামে পরিচিত। আদতে এটি এক প্রস্তরখণ্ড। ধর্মরাজের ধ্যানমন্ত্র হল, 'ঐ হ্রীং চন্দ্রেশ্বর ধর্মরাজায় নমঃ।' এখানে কাছেই রয়েছে বাঘরায় চণ্ডী।

৯। বড়রা- খয়রাশোল। ধর্মরাজের সঙ্গে রয়েছেন শীতলাচণ্ডী। চৈত্রে দেবীর পুজো হয়। হয় পাঁঠাবলি। সঙ্গে মনসাও রয়েছেন। শ্রাবণে হয় পুজো।

১০। ভীমগড়- ধর্মরাজ এখানে শিলা। কাছেই পৌরাণিক ভৈরব শীলা। মহাভারতের ভীম কর্তৃক স্থাপিত লোকবিশ্বাস বলে নাম 'ভীমেশ্বর'।

১১। গোয়ালপাড়া- বোলপুর-শান্তিনিকেতনের সামান্য উত্তরে।

১২। রসা- খয়রাশোল। শিলাখণ্ডের নাম বাথান রায়। এক গো-বাথানে ধর্মরাজকে পাওয়া গিয়েছিল বলা হয়ে থাকে।

১৩। শিরা- খয়রাশোল। ৭টি শিলাখণ্ড রয়েছে। বুড়ো রায়, কালা রায় ইত্যাদি নাম তাঁদের।

১৪। হজরতপুর- খয়রাশোলে। বুড়ো রায়ের পূজা হয় আষাঢ় পূর্ণিমায়।

১৫। কড্ডাং- দুবরাজপুরে পাশাপাশি দুই গ্রাম সিজে ও কড্ডাং মিলে নাম সিজেকড্ডাং। ধর্মরাজের নাম 'আদিরাক্ষ'। বিজয়া দশমীতে পুজো হয়। হাঁপানির ঔষধের জন্য বিখ্যাত।

১৬। ছিনপাই- দুবরাজপুর। নাম সুন্দর রায়। পূজারি ব্রাহ্মণ।

১৭। গোয়ালিয়াড়া-দুবরাজপুর।

১৮। জামথলি-দুবরাজপুর। এখানে ধর্মরাজের কোনো বিশেষ নাম নেই। পাশেই রয়েছে শিবমন্দির।

১৯। দুবরাজপুর- এখানে ধর্মরাজ হলেন এলো রায়। কাছেই আছেন কালা রায় ও খোঁড়া রায়। বন্ধ্যা নারীরা সন্তান কামনায় এখানে যজ্ঞের কলা ভক্ষণ করেন অনেকসময়।

২০। নারায়ণপুর- ছিনপাই সংলগ্ন এলাকা। দেবতার নাম বুড়ো রায়।

২১। বাঁধের শোল- এখানে ধর্মরাজের আলাদা কোনো নাম নেই। কূর্মাকৃতি শিলা ও বাণেশ্বর রয়েছে।

২২। কৃষ্ণপুর- খয়রাশোল। ধর্মরাজ শিবলিঙ্গের মতন।

২৩। সিউড়ি শহর- শহরে পাঁচস্থানে ধর্মরাজের পূজা হয়। সোনাতোড়, মালিপাড়া, বারুইপাড়া, আনন্দপুর, শেহড়াপাড়া।

২৪। সিদুলি- সিউড়ি। ধর্মরাজের আলাদা নাম নেই।

২৫। লাঙ্গুলিয়া- ময়ূরাক্ষীর তীরে। নাম খোঁড়া ধর্মরাজ।

২৬। লম্বোদরপুর- সিউড়ি। ৬ টি শিলাখণ্ড। চাঁদ রায়, বাঘ রায় ইত্যাদি নাম।

২৭। মালাবেড়িয়া- সাঁইথিয়া। ধর্মপুকুর নামে পুকুর রয়েছে। প্রবাদ হল এক কৃষক ক্লান্ত হয়ে গাছতলায় ঘুমিয়ে পড়লে স্বপ্নে এক জ্যোতির্ময় পুরুষ এসে বলেন গ্রামের উত্তরে এক পুকুর থেকে ধর্মরাজকে উদ্ধার করে প্রতিষ্ঠার কথা।

২৮। মল্লিকপুর- সিউড়ি। চন্দ্রভাগা নদীর তীরে।

২৯। মুড়োমাঠ- সিউড়ি। মূলত তপশিলি এলাকা। পাশে শিবলিঙ্গ। নাম স্ফটিকেশ্বর শিব। সঙ্গে আছেন মঙ্গলচণ্ডী।

৩০। কোমা- সিউড়ি। এখানের ধর্মঠাকুর বিখ্যাত। স্থানীয় বিশ্বাস একজন শঙ্করাচার্য এই ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

৩১। তাঁতিপাড়া- রাজনগর। সিংহাসনে শিলাখণ্ড। ডানে রয়েছে সর্পবেষ্টিত মনসা।

৩২। ভবানীপুর- রাজনগর। নুড়িপাথরের নানা নাম। বুড়োরাজ, সেঙ্গুরাজ, বিধায়করাজ।

৩৩। লখীন্দরপুর- সিউড়ি। কূর্মাকৃতি শিলা।

৩৪। রাইপুর- সিউড়ি। চন্দ্রভাগার তীরে তিনটি ধর্মরাজ।

৩৫। ভগবানবাটি- সিউড়ি। অনেকগুলি শিলাখণ্ড। ধর্মরাজের নাম রঘুনাথ। পাশে কালীন্দর শিব। আছেন ভৈরবনাথও।

৩৬। ভাণ্ডীরবন- এখানে ভাণ্ডীশ্বর শিব বিখ্যাত। কিন্তু গ্রামে আছেন ধর্মরাজের গাদি। বর্তমানে বীরসিংহপুর গ্রামে কালীমন্দিরের পাশে ধর্মরাজের থান।

৩৭। পুরন্দরপুর- সিউড়ি। নাম পুরন্দরনাথ। নিকটেই রয়েছেন ভৈরবনাথ, চামুণ্ডা, কালী, কেলে রায়, চাঁদ রায় প্রমুখ।

৩৮। জীবধরপুর- সিউড়ি। শিলাখণ্ড এখানেও।

৩৯। গজালপুর- সিউড়ি। ৭ টি শিলাখণ্ড রয়েছে।

৪০। কালীপুর- সিউড়ি। দুটি গোলাকার শিলাখণ্ড। চাঁদ রায় ও তুলো রায় নাম।

৪১। কচুজোড়- সিউড়ি। অনেকগুলি শিলাখণ্ড।

৪২। ইন্দ্রগাছা-সিউড়ি।

৪৩। বড় সাংড়া-সিউড়ি। ধর্মরাজের নাম পুরন্দর।

৪৪। বেলিয়া-আহমদপুর। ধর্মরাজের নাম নেই। কাছেই আছে শিবলিঙ্গ। পাশেই কালীমন্দির।

৪৫। জোল্ল-সাঁইথিয়া। ধর্মরাজের নাম পুরন্দর। ডোমদের স্থাপিত ধর্মরাজ।

৪৬। ঈশ্বরপুর-সাঁইথিয়া। ধর্মরাজের নাম সুন্দর।

৪৭। লায়েকপুর- লাভপুর। পেতলের গামলায় সারা বছর বড়ো দিঘিতে ডোবানো থাকে ধর্মরাজ।

৪৮। দাঁড়কা- লাভপুর। পোদ্দারপাড়ায় চারটে শিলা চাঁদ রায়, ফটিক রায় ইত্যাদি নামে এবং বাবুপাড়ায় লালা রায়, কটা রায়, কালা রায় ইত্যাদি নামে পূজিত হন। গ্রামের মাঝে বটবৃক্ষতলে ব্রহ্মদৈত্য, অশ্বত্থতলে যষ্ঠী এবং মঙ্গলচণ্ডী আছেন। গ্রামে আছেন দণ্ডকেশ্বর শিব, যাঁর নামে গ্রামের নাম হয়েছে।

৪৯। কালুহা, জগদীশপুর- ৩০/৪০ টি শিলা রয়েছে। ধর্মরাজের স্থানীয় কোনো নাম নেই। সঙ্গে রয়েছে শিব ও কালী।

৫০। রাজনগরে নাকাশ, পাতাডং গ্রামদুটিতে ধর্মরাজ রয়েছেন।

৫১। ময়ূরশ্বরে রাতমা, শেখপুর, দাদপুর গ্রামে রয়েছেন।

৫২। সুগুণপুর- মহম্মদবাজারে ময়ূরাক্ষীর তীরে। দুটি নাম পাওয়া গিয়েছে। বুড়ো ধর্মরাজ ও খেলারাম।

৫৩। খয়রাকুঁড়ি- মহম্মদবাজারে। নাম শ্বেতচাঁদ।

৫৪। ন-বেলেড়া- ময়ূরেশ্বর। চারটি শিলা। ফটিক রায়, নীল রায় ইত্যাদি নাম।

৫৫। কুমারপুর- ময়ূরেশ্বর। চারটি শিলা। লালাচাঁদ ইত্যাদি নাম।

৫৬। কামারহাটি- ময়ূরেশ্বর। শিলামূর্তি মাটিতে প্রোথিত।

৫৭। সুপুর-বোলপুর। নাম সুক্ষ রায়। লোকমুখে শম্ভু রায় হয়ে গিয়েছে।

৫৮। মোহনপুর- নানুর। ধর্মরাজের নাম নেই।

৫৯। খুজুটিপাড়া- নানুর। ধর্মরাজের নাম খুজুটেশ্বর।

৬০। বড়া- নানুর। এখানেও নাম খুজুটেশ্বর। ইত্যাদি।”[৫]

ক্ষেত্রপাল : বীরভূমের বিভিন্ন গ্রামে ক্ষেত্রপালের পুজো হয়। এটি বিশেষ করে শ্রাবণ মাসে হয়ে থাকে। পুজার দিনে বাড়িতে অরন্ধন পালিত হয়। আগের দিন রান্না করে রাখা হয়।

শিবঠাকুর : প্রথমে শিব ছিল রুদ্র বা ধ্বংসের দেবতা। পরবর্তীকালে এটি মানুষের সুখ-সমৃদ্ধি নিয়ে আসে। বীরভূম জেলার প্রায় প্রতিটি গ্রামেই শিবের মন্দির ও শিবলিঙ্গ রয়েছে। খেটে খাওয়া মানুষের সঙ্গে শিবের জীবন ও চরিত্রের মিল রয়েছে।

ব্রহ্মচারী ঠাকুর : ব্রহ্মচারী ঠাকুর নামক দেবতার নির্দিষ্ট কোন মূর্তি নেই। কিছু শিলাখণ্ডকে ব্রহ্মচারী জ্ঞানে পুজো করা হয়। সাধারণত পুজোর উপকরণের সাথে মদ ও গাঁজা দিয়ে এই দেবতার পুজো দিতে হয়। শিশু ও নারীদের নানা রোগ থেকে মুক্তির জন্য এই দেবতার কাছে মানত করা হয়। বীরভূমের কয়েকটি গ্রামে এই পুজো হয়ে থাকে।[৬]

সত্যপীর : ‘সত্যপীর’ নামক লৌকিক দেবতাটি হল বীরভূম জেলার সাম্প্রদায়িক ঐক্যের ফসল। ফারসী ‘পীর’ শব্দের অর্থ হল মুসলিম আধ্যাত্মিক সিদ্ধপুরুষ। অন্যদিকে সত্যনারায়ণের ‘সত্য’ এতে যুক্ত হয়েছে। গ্রামের একটি গাছের তলায় এই দেবতা অধিষ্ঠান করে থাকে। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে এই দেবতার পুজো করে থাকে। এই সত্যপীর নামক দেবতার কাছে বাড়িতে পিঁপড়ে হলে তা কমানোর জন্য মানত করা হয়।

মারাংবুরু : বীরভূমে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের কাজে মারাংবুরু একটি শক্তিশালী দেবতা। সংসারের মঙ্গলের জন্য এবং বিভিন্ন অসুখ-বিসুখ থেকে উদ্ধার পেতে মানুষেরা এই দেবতার পুজো করে থাকে। এই দেবতাকে সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা রূপে কল্পনা করা হয়।

চণ্ডী : রাঢ়ের বহুগ্রামে ধর্মঠাকুরের সঙ্গে চণ্ডী, মঙ্গলচণ্ডী, ব্রাহ্মণ চণ্ডী, ঢেলাই চণ্ডী, বাঘরায় চণ্ডী দেবীর পুজো হয়ে থাকে। এই দেবীর নির্দিষ্ট কোন মূর্তি নেই। বৃক্ষ বা শিলাখণ্ডে এঁর পুজো হয়ে থাকে। চণ্ডীর বার্ষিক পুজো হয়, নিত্যপুজো হয় না। গ্রামের অনুন্নত শ্রেণি দেবী চণ্ডীর পুজো করে থাকেন। জৈষ্ঠ্য মাসের প্রতি মঙ্গলবার গ্রামের গৃহবধূরা 'মঙ্গলচণ্ডীর' পুজো করে থাকে। সংসারে সকল সদস্যদের মঙ্গল সাধনের জন্য এই পুজো করা হয়। ঢোলাইচণ্ডী বৃক্ষদেবতা হিসাবে পূজিত হন। আদিন যুগ থেকেই বৃক্ষ বন্যার প্রকোপ থেকে, হিংস্র জন্তুর কবল থেকে মানুষের জীবন রক্ষা করেছে। কামারহাটি শিবগ্রামের মোড়ে (ময়ূরেশ্বর) ঢোলাইচণ্ডীর পুজো চালু রয়েছে। বৃক্ষতলায় ঢেলা বা ইঁটের টুকরো নৈবেদ্য হিসাবে ছুঁড়ে দেয়। জেলার বিভিন্ন গ্রামের মানুষেরা ধান কাটার পর 'বাঘরাই চণ্ডী' দেবীর পুজো করেন। তাই স্বাভাবিক ভাবেই এই বাঘরাই চণ্ডী শস্যদেবী নামে পরিচিত। আবার অন্যদিকে অনেকের বিশ্বাস রয়েছে যে, হিংস্র পশুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মানুষেরা বাঘরাই দেবীর পুজো করেন। সাধারণ মানুষ একটি তেঁতুল গাছকে 'ব্রাহ্মণচণ্ডী' রূপে পুজো করেন। কথিত রয়েছে এই তেঁতুলগাছই একজন নববধূকে বর্গীদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করেন। অন্যদিকে শান্তিনিকেতনের কাছে শেহালাই নামে একটি ছোটগ্রাম রয়েছে যেখানে দেবী 'নাটাইচণ্ডী' রূপে পূজিত হন। অপরদিকে জনশ্রুতি রয়েছে যে, দেবী 'পায়রাচণ্ডী' এক ভক্তকে পায়রার রূপ ধারণ করে সাহায্য করেছিলেন বলে দেবীর এইরূপ নামকরণ হয়েছে। দেবী 'পায়রাচণ্ডী' খয়রাশোল থানার পারশুণ্ডি নামক গ্রামে পূজিত হন। সাধারণত: সর্বসম্পদ প্রদায়িনী, শস্য দায়িনী, সমস্ত অমঙ্গল নাশিনী রূপে দেবী চণ্ডীকে পুজো করা হয়।[৭]

পলাশবাসিনী : লৌকিক দেবী পলাশবাসিনীর বার্ষিক পুজো করা হয়। এই দেবীর কোন মূর্তি নেই, পলাশবনে একখণ্ড শিলাকে দেবী রূপে কল্পনা করে পুজো করা হয়। পুত্র সন্তান লাভের জন্য এই পলাশবাসিনী দেবীর কাছে মানত করা হয়।

মনসা : ধর্মঠাকুরের সঙ্গে মনসার বিশেষ সম্পর্ক আছে। তাই প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায়, ধর্মঠাকুর ও মনসা পাশাপাশি বিরাজ করছেন। ডঃ সুকুমার সেন মধ্যযুগীয় একটি প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। "বৃন্দাবন দাসের সমসাময়িক চূড়ামনি দাস তাঁর 'গৌরাঙ্গ বিজয়ে' গৌরাঙ্গের গঙ্গাযাত্রা প্রসঙ্গে ভাগলপুরের কাছে ধর্মঠাকুর ও মনসার তৎকাল প্রসিদ্ধ মন্দিরের উল্লেখ করেছেন—

বাহাগলপুর তেজি যাইতে উত্তরে,
দেখিলত ধর্মরাজা মনসার ঘরে।"[৮]

জঙ্গলে পরিপূর্ণ বীরভূম জেলায় সাপের আধিক্য বেশি। এই ভীতি মানুষকে সর্পদেবীর কল্পনায় সাহায্য করেছে। তাই এই অঞ্চলে সর্পের দেবী মনসার পুজোর প্রাধান্য বেশি। প্রধানতঃ নিম্ন বর্ণের হিন্দু, তপশিলী

জাতি এবং উপজাতিদের মধ্যে এই পূজার প্রচলন রয়েছে। বেশিরভাগ স্থানে ফনিমনসা গাছকে কেন্দ্র করে মনসার পূজো হয়। আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তিতে এই পুজো হয়ে থাকে। কোনও কোনও স্থানে ভাদ্র মাসের দ্বিতীয় পঞ্চমী তিথিতে মনসা পুজো হয়, একে 'বগা পঞ্চমী' বলে। এই দিন মনসার ভক্তরা মনসার ঝাঁপান গান করে থাকে।

শীতলা : "ড. পঞ্চানন মণ্ডলের মতে শীতলা রুদ্র শিবের শ্রমজ কন্যা এবং দক্ষিণ রায় ও কালু রায়ের ভগিনী। শীতলা আবার মনসার সহচরীও।"[৯] অন্যদিকে অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন, বৌদ্ধ জাঙ্গুলী যেমন মনসায় রূপান্তরিত হয়েছে, ঠিক তেমনি বৌদ্ধ 'পর্ণশবরী' শীতলায় পরিণত।[১০] ভয়ঙ্করী দেবী শীতলার বাহন হল গর্দভ। দেবীর রোষের প্রকোপ থেকে উদ্ধার পাবার কোনো পথ নেই। দেবীর পুজো বেশিরভাগ স্থানে মন্দিরে হয়। প্রত্যেক শনি-মঙ্গলবার দেবীর পুজো হয়। আবার কোনো কোনো স্থানে দেবীর বার্ষিক পুজো হয়ে থাকে। সাধারণত বাউরি, হাড়ি, বাগদী প্রভৃতিদের দ্বারা দেবী পূজিত হন। কোনো কোনো স্থানে গণকেরা দেবী শীতলার পুজো করেন। হাম, বসন্ত প্রভৃতি রোগ-ব্যাধি হলে দেবী শীতলার বিশেষ পুজোর ব্যবস্থা করা হয়। তখন রোগীর বাড়িতে আমিষ আহার গ্রহণ করা, সিঁদুর-আলতা পরা, নতুন বস্ত্র পরিধান করা নিষিদ্ধ থাকে। এই রোগ ছোঁয়াচে হওয়ায় রোগীর সংস্পর্শে না থেকে দূরত্ব রাখা প্রয়োজন। জেলায় বিভিন্ন স্থান রয়েছে যেখানে ধর্মরাজ ঠাকুরের সঙ্গে দেবী শীতলা একসাথে অধিষ্ঠান করছেন। যেমন— ভবানীপুর মন্দির (রাজনগর থানা), বড়রার মন্দির (খয়রাশোল থানা), ঘুড়িষার বুড়ো রায়ের মন্দির (ইলামবাজার থানা) ইত্যাদি। দেবী শীতলা সম্পর্কে শোনা যায়—

"শীতলা হইলে রুষ্ট
লোক সব পায় কষ্ট
পাছে পাছে ফেরে নানা রোগ।
শীতলার দয়া হলে ধন পুত সবই মিলে
দূরে যায় দুঃখ জ্বালা শোক।"[১১]

বিশালাক্ষী : কবি চণ্ডীদাসের আরাধ্য দেবী ছিলেন দেবী বিশালাক্ষী। নানুরে এর পাথরের মূর্তি রয়েছে। এই মূর্তিটি দেখতে সরস্বতী দেবীর মতো। ব্রাহ্মণ দ্বারা এই দেবীর নিত্যপুজো হয়ে থাকে। সাধারণত সন্তান কামনা ও ভালো চাষ আবাদের জন্য এই দেবীর পূজো করা হয়।

ইতু দেবী : গ্রামের বিবাহিত ও অবিবাহিত নারীরা অগ্রহায়ণ মাসের প্রতি রবিবার ইতু নামক দেবীর পুজো করে থাকে। এই দিন ব্রতিনীগণ নিরামিষ আহার ভোজন করে। শেষ রবিবার পুজোর ঘটটিকে সর্ষে ফুল দিয়ে পুজো করেন। অনেকে ইতুকে লৌকিক সূর্যদেবতা বলে মনে করেন। সূর্যের অপর নাম হল, আদিত্য, আদিত্য> আইও> ইও> ইত> ইতু- এইভাবে রূপান্তরিত হয়ে দেবী ইতু হয়েছে বলে মনে করা হয়। অন্যদিকে অনেকেই দেবী ইতুকে লক্ষ্মীরই লৌকিক রূপ বলে মনে করে থাকেন।

কৃষ্ণকালী : বীরভূম জেলা হল বৈষ্ণব, শাক্ত ও তান্ত্রিক ধর্মের মিলন ভূমি। একটি মূর্তিতে কৃষ্ণ ও কালী উভয় রূপই বিদ্যমান থাকে। শক্তির দেবী কালী এবং শান্তির দেবতা কৃষ্ণ-এই উভয়ে মিলে হয় কৃষ্ণকালী। বিভিন্ন স্থানের মন্দিরে পুরোহিতরা এই মূর্তির নিত্য পুজো করে থাকে।

ভাদু : বীরভূম জেলায় মহাসমারোহে এই ভাদু পূজার আয়োজন করা হয়। সাধারণ জনশ্রুতি রয়েছে যে, রাজকুমারী ভদ্রাবতী এক সাধারণ মানুষের প্রেমে আসক্ত হয়ে পড়েন। তবে শেষপর্যন্ত প্রেমিকের সঙ্গে মিলনে বাধা থাকায় ভাদু আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। অপর একটি জনশ্রুতি রয়েছে, অপরের দুঃখে কাতর ভাদু অত্যাচারিত অন্ত্যজ শ্রেনীর পক্ষ অবলম্বন করায় রাজার আভিজাত্যে আঘাত লাগে এবং ব্যর্থ হয়ে ভাদু আত্মহত্যা করে। দুটি কিংবদন্তীর মধ্যে যেকোনো কারণেই হোক, ভাদুকে আত্মহননের পথ বেছে নিতে হয়েছিল। তাই মানুষের সহানুভূতি ভাদুকে দেবীর পর্যায়ে উন্নীত করে। সমগ্র ভাদ্র মাস জুড়ে নারী-পুরুষেরা এই পুজো করে থাকে। মাটির ভাদু মূর্তি তৈরী করে শাড়ি, গয়না পড়িয়ে সাজিয়ে পুরুষেরা কোলে নিয়ে চার-পাঁচ জনের একটি দলে ভাদু নাচ ও গান করা হয়। ভাদ্র মাসের শেষ তিন দিন গৃহিনীরা ভাদু মূর্তিকে সামনে রেখে, ফল-ফুল-মিষ্টি দিয়ে সাজিয়ে সকলে একত্রিত হয়ে গান করে। এই গানের মধ্যে তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং কুমারী কন্যার কামনা-বাসনার কথা প্রকাশিত হয়। সংক্রান্তির দিন ভাদু মূর্তিটি পুকুরে বিসর্জন দিয়ে দেওয়া হয়।

ভাঁজো : ভাঁজো হল বীরভূমের একটি লৌকিক দেবী। এই দেবী কৃষির সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত। ভাঁজো উপলক্ষ্যে মাটির সরাতে ধান, কালোকলাই, সরষে প্রভৃতি শষ্য খুবই সতর্কতা অবলম্বন করে ছড়ানো হয় এবং বিশ্বাস করা হয় সরার চারাগুলি ভালো হলে ক্ষেতের ফসলও ভালো হবে। অন্যদিকে বীজের সুপ্ত দশা ভেঙে ভালো অঙ্কুরোদগমের জন্য ব্রতিনীরা প্রার্থনা করেন—

“একদিনে ভাজো আমার দুয়ে দিলো পা
তেমুতো সোনার ভাজো গা তোলে না
গা তোলোরে গা তোলোরে খেতে দেবো ননী
জনম সফল মা বলো তুমি।।”[১২]

ছোট-বড় বিভিন্ন বয়সের ছেলে মেয়েরা সাধ্য মতো ফল-মিষ্টি-শালুক ফুল ইত্যদি ভাঁজোর সামনে সাজিয়ে দেবীকে এক কুমারী কন্যারূপে কল্পনা করে পুজো করা হয়। ভাদ্র মাসের শুক্লা একাদশীতে এই পুজো হয়ে থাকে। পুজোর আট দিনের দিন ভাঁজোকে সাজিয়ে নাচ-গান করতে করতে সমগ্র গ্রাম পরিক্রমা করা হয়। এরপর নয় দিনের দিন দেবী ভাঁজোকে জলে বিসর্জন দেওয়া হয়।

সাঁঝপুজোনি : কার্তিক মাসের সংক্রান্তি থেকে অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তি পর্যন্ত প্রত্যেক রবিবার দিন সন্ধ্যায় মেয়েরা সাঁঝপুজোনি দেবীর পুজো করে থাকে। এই পুজোয় পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না। অভিভাবক হিসাবে বয়স্ক মহিলারা পুজোর সমস্ত দায়িত্ব পালন করেন। সূর্য অস্ত যাওয়ার পর বাড়ির উঠানে হরিতলায়

মেয়েরা চালের গুঁড়ি দিয়ে আলপনা এবং বাহান্নটি ঘর আঁকে। প্রত্যেক ঘরে হাত দিয়ে মন্ত্র উচ্চারণ করা হয়। সংসারের সকলের জন্য মঙ্গলের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করা হয়—

"সাঁঝ পুজোনি সেঁজুতি
ষোলো ঘরে ষোলো ব্রতী
ব্রতী হয়ে মাগি বর
ধনে পুত্রে বাড়ুক
মা বাপের ঘর।"[১৩]

আবার নারীরা নিজেদের ভবিষ্যত জীবন যাতে সুখময় হয় তার জন্য বলে—

"হে হর মাগি বর
স্বামী হোক লক্ষেশ্বর।"[১৪]

অন্যদিকে তৎকালীন সময়ে বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। তাই নারীরা সতীনের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে বলে উঠত—

"কুলগাছ কুলগাছ ঝাঁকুড়ি
সতীন বিটি মাকড়ি (বানরী, স্ত্রীবানর)
সাত সতীনের সাতটি কোটো
আমার হাতে নবীন (নয়টি) কোটো।।
নবীন কোটো নড়ে চড়ে
সাত সতীনের মুখটি পোড়ে।।"[১৫]

এইভাবে চারবছর ব্রত করার পর ভ্রাতৃস্থানীয় কেউ ব্রতিনীর মাথায় ছাতা ধরেন এবং চক্রাকারে ঘোরাতে থাকেন। ব্রতিনীরা পুজোর দিন নিরামিষ আহার গ্রহণ করেন। পুজো সমাপ্ত হলে সেইদিন রাত্রিতেই ঘট, ফুল পুকুরের জলে বিসর্জন দেওয়ার সময় বলা হয়—

"ঘট যায় ভেসে
ভাই আসে হেসে
ফুল যায় ভেসে
লক্ষ্মী আসে হেসে।"[১৬]

সবশেষে ব্রতিনীগণ সংসারের সকলের পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, স্বামী, ভাই-বোন, এমনকি গৃহপালিত পশু-পাখির মঙ্গল কামনা করে পুজো শেষ করেন।

তথ্যসূত্র :

১. মিত্র অমলেন্দু, রাঢ়ের সংস্কৃতি ও ধর্মঠাকুর (বীরভূমিতে প্রাপ্ত তথ্যালোকে), কলকাতা : ফার্মা কে এল মুখোপাধ্যায়, ১৯৭২, পৃ. ৪৮

২. তদেব, পৃ. ৪৮
৩. বীরভূমের লোকসংস্কৃতি, সম্পাদনা- দেবাশিস সাহা, আদিত্য মুখোপাধ্যায়, অভিযান পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ- ফেব্রুয়ারি ২০২৩, ১/১ এ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা- ৭৩, পৃ. ৫৮
৪. বীরভূম (জেলা লোকসংস্কৃতি পরিচয় গ্রন্থ) তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৬৬ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, প্রথম প্রকাশ- ডিসেম্বর ২০১৮, কলকাতা-১২, পৃ. ১১৯
৫. বীরভূমের লোকসংস্কৃতি, পৃ. ৫৯-৬২
৬. মিত্র অমলেন্দু, রাঢ়ের সংস্কৃতি ও ধর্মঠাকুর (বীরভূমিতে প্রাপ্ত তথ্যালোকে), কলকাতা : ফার্মা কে এল মুখোপাধ্যায়, পৃ. ৩৬
৭. বীরভূম (জেলা লোকসংস্কৃতি পরিচয় গ্রন্থ) তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৬৬ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, প্রথম প্রকাশ- ডিসেম্বর ২০১৮, কলকাতা-১২, পৃ. ১১৬
৮. মিত্র অমলেন্দু, রাঢ়ের সংস্কৃতি ও ধর্মঠাকুর (বীরভূমিতে প্রাপ্ত তথ্যালোকে), কলকাতা : ফার্মা কে এল মুখোপাধ্যায়, ১৯৭২, পৃ. ৭৩-৭৪
৯. বীরভূম (জেলা লোকসংস্কৃতি পরিচয় গ্রন্থ) তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৬৬ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, প্রথম প্রকাশ- ডিসেম্বর ২০১৮, কলকাতা-১২, পৃ. ১১৬
১০. তদেব, পৃ. ১১৭
১১. তদেব, পৃ. ১১৮
১২. বীরভূমের লোকসংস্কৃতি, পৃ. ৬৯
১৩. তদেব, পৃ. ৭৪
১৪. তদেব
১৫. তদেব
১৬. তদেব, পৃ. ৭৫

গ্রন্থপঞ্জি :

কামিল্যা চৌধুরী মিহির, রাঢ়ের গ্রাম্যদেবতা, বর্ধমান, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৯

ঘোষ বিনয়, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, প্রকাশ ভবন, ১৯৭৬

ঘোষ বিনয়, বাংলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৭৯

বসু গোপেন্দ্রকৃষ্ণ, বাংলার লৌকিক দেবতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৭৮

বীরভূম (জেলা লোকসংস্কৃতি পরিচয় গ্রন্থ), তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৬৬, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা-১২

মিত্র অমলেন্দু, রাঢ়ের সংস্কৃতি ও ধর্মঠাকুর (বীরভূমিতে প্রাপ্ত তথ্যালোকে), কলকাতা : ফার্মা কে এল মুখোপাধ্যায়, ১৯৭২

মিত্র গৌরীহর, বীরভূমের ইতিহাস (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড), আশাদীপ, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারী ২০১২

সাহা দেবাশিস, মুখোপাধ্যায় আদিত্য (সম্পাদনা), বীরভূমের লোকসংস্কৃতি, অভিযান পাবলিশার্স, ১/১ এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, প্রথম প্রকাশ- ফেব্রুয়ারি ২০২৩, কলকাতা-৭৩